যায়যায়দিন

তারিখ ১০ FEB 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়: সমস্যা-সঙ্কট ও সম্ভাবনা

ড. ইশা মোহাম্মদ

জন্মভুলেই যেন জন্ম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। আর তাই যেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় প্রায়ই খবর হয় সংবাদপত্রে। কখনো ভালো, কখনো খারাপ। খারাপ খবরই বেশি। ভালো খবর অবশ্য প্রচারিত হওয়ার তাগিদ অনুভব করে না কেউই। কেননা, এটা একটা স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর অধীন কলেজগুলোর অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়ার সুযোগ নেই। ফলে আয়-উপার্জনের জন্য প্রচার করে ছাত্রছাত্রী কিংবা তাদের অভিভাবকদের ধরার দরকার নেই। খদ্দের ধরাধরির বিষয়টি সরকার ফরমান জারি করে ধরিয়ে দিয়েছে। তাই উপার্জন নিশ্চিত। এটিকে সুযোগ হিসেবে নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নানাবিধ কাজকর্ম করে যাচ্ছে। যে ব্যাপারে কারোরই কিছু যেন করণীয় নেই। যেমন- প্রতিটি পরীক্ষাতেই কোনো না কোনো বিষয়ে প্রশ্নপত্র আউট হয়। কারণ সবারই জানা হয়ে গেছে। কিন্তু সমাধান হয় না। একটি বড় কারণ হচ্ছে ননটিচার ব্যক্তির সম্পৃক্ততা। প্রশ্নপত্র তৈরির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কয়েকটি ধাপে যারা শিক্ষকতা করেন না তারাও সংশ্লিষ্ট হন। ফলে প্রশ্নপত্রের কেনাবেচার সঙ্গে কোন কোন ব্যবসায়ী শিক্ষক জড়িত এটি প্রমাণ করা কঠিন হয়ে যায়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে নকল সার্টিফিকেট এবং মার্কশিট। হয়তো বলা যাবে, বাংলাদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের জাল সার্টিফিকেট এবং মার্কশিট অল্প বিস্তর পাওয়া যায় অনেক আগে থেকেই। যেমন পুলিশি তদন্তেই জানা গেছে, নীলক্ষেতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাল সার্টিফিকেট পাওয়া যায় পয়সার বিনিময়ে। জাল জালিয়াতি তো বাংলাদেশে হচ্ছেই প্রতিনিয়ত। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নাম বেশি। বেশি হওয়ার অন্যতম কারণ হতে পারে এর প্রতি বছরের গ্র্যাজুয়েট সংখ্যা অন্য যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেশি। ওই হিসেবে জালিয়াতির সংখ্যাও বেশি হতে পারে। এ রকম বাজে কথা বলে কি আত্মরক্ষা করা যায়? যায় না। কিন্তু এবারকার খবরের বিষয়টি অন্য স্বাদের। যার সঙ্গে প্রচলিত ও প্রথাগত বদনামের মিল নেই। ভর্তি পরীক্ষায় বিশেষ একটি গোষ্ঠীকে সুবিধা দেয়ার জন্য প্রশ্নপত্র করা হয়েছে বলে অনেক পত্রিকা অভিযোগ সহকারে সংবাদ ছেপেছে। এরপরও হয়তো আবার অন্যরকম অভিযোগ 'সংবাদ' হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অবস্থা তাতে সংবাদ হওয়ার হাজার পথ যেন এর খোলা আছে। কেন এমন অবস্থা তৈরি হলো। কেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় না হয়ে বিজাতীয় হয়ে গেল। এর উত্তরের মধ্যেই হয়তো সমস্যাগুলোর সমাধান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

জন্মের সময়ই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রকল্প তখন থেকেই এটি নন-একাডেমিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তৈরি করার একটা অসৎ উদ্দেশ্য হয়তো কোনো কোনো মহলের মনে কাজ করেছিল। এবং সে কারণেই প্রথম উপাচার্য ছাত্রছাত্রী পড়ানোর ব্যবস্থাকে গুরুত্ব না দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ এবং সনদ বিতরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ওইসব অঙ্গপ্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেন। জানা যায়, তিনি সার্থক হয়েছিলেন। কেননা, তখন থেকে অদ্যাবধি এখানে সম্মান কিংবা মাস্টার্স শ্রেণীতে কাউকে পড়ানো হয়নি। এটি যে অপরাধ সেটি মনে মনে অনুভব করে প্রতিজন উপাচার্য সাফাই গাওয়ার সুরে বলে থাকেন, বাংলাদেশের সবকটি ডিগ্রি এবং অনার্স-মাস্টার্স কলেজের ক্যাম্পাসেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। ওইগুলোই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। এমনভাবে বিশেষ মহল এটিকে বুঝিয়েছে যে, সবকটি সরকারই একই রূপ আচরণ করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে। কোনো সরকারেরই মাথায় আসেনি যে, পরীক্ষা নেয়ার এবং সনদ বিতরণের জন্য সাধারণ মানুষের রক্ত খাওয়ার কোনো নৈতিক অধিকার কারোরই নেই। যারা পড়ায় তারাই পরীক্ষা নিতে পারে এবং তারাই সনদ দিতে পারে। এটি তাদেরই অধিকার। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাদের অধিকার হরণ করেছে এবং ইচ্ছামতো যাকে তাকে সনদ দিয়ে যাচ্ছে। জাল জালিয়াতি দেখার কিংবা বোঝারও কেউ নেই। একমাত্র ওইসব কলেজের বিভাগগুলোই বলতে পারবে ছেলেমেয়ে তাদের কলেজের কি না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা একেবারেই এলিয়েন। প্রকৃত-অপ্রকৃতের মধ্যে এতো দূরত্ব অবস্থান করে যে পার্থক্য করা একেবারেই সম্ভব নয়। তার প্রমাণ এতোদিনে হয়ে গেছে।

> বিশ্ববিদ্যালয় আর কলেজ এক নয়। আমরা যদি মনে করি গরিবদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবো তবে প্রত্যন্তে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে হবে। কলেজগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় মনে করে আহ্লাদ করলে দেশ ও জাতির মেরুদণ্ডে ঘুণপোকার আক্রমণ হবে। হতে পারে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন বিভাগীয় পর্যায়ে মাস্টার্স কোর্স পড়িয়ে কলেজ থেকে অনার্স করাদের একটা হিল্লে করা। যতোজন অনার্স পাস করে ততোজন মাস্টার্স করতে পারে না। এটি জাতির প্রয়োজন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাস্টার্স পড়ায়, অনার্স পড়ায় না। তারা তাদের মতো একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছে। আমরা আমাদের মতো অন্যরকম একটা ব্যবস্থা করে নিই। নইলে বাংলাদেশকে আজীবন পরীক্ষা বিষয়ক রামযাত্রা শুনতেই হবে।

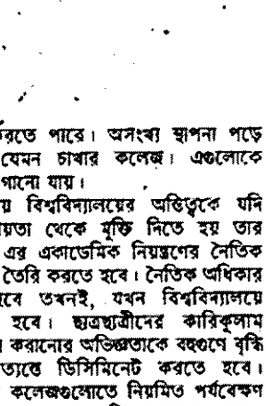

অপচয়হেতু দেশ ও জাতির ক্ষতি। তারপরও কলেজগুলোকে 'নিয়ন্ত্রণ' কিংবা 'সাবধান' করার সুযোগ নেই। সরকারি কলেজগুলো চলে সরকারি মতে এবং বেসরকারিগুলো চলে রাজনৈতিক চালে। এ দুটির কোথাও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো স্থান নেই। ফলে মনিটরিং করে একাডেমিক এক্সেসেলেন্স বাড়ানোর ঘটনা কখনোই ঘটবে না। তাছাড়া এতোদূর থেকে এতো প্রত্যন্ত কলেজেও নিয়মিত মনিটরিং সম্ভব নয়। কাছাকাছি হলে হয়তো কিছুটা ভূমিকা পালন করা যেতো। কিন্তু কলেজগুলোর কাছাকাছি কোনো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নেই। কিন্তু সেটি বাস্তবায়নযোগ্য। কেননা, সরকার চাইলেই প্রত্যন্ত এলাকায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব স্থানিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সমীপবর্তী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস তৈরি করলে পরীক্ষা নেয়া এবং সনদ দেয়ার ব্যাপারে অহেতুক সমস্যা হবে না। তাছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব ক্যাম্পাস তৈরি হলেও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ হতে অনেক সময় লাগবে। অভিজ্ঞতার আলোকে আলোকমালা না হওয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক নিয়ন্ত্রণে থাকলে ভালো হয়।

প্রয়োজন বাংলাদেশের প্রতিটি স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা। যেমন- মৎস্য বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য মৎস্য ভূমি প্রাধিকার পেতে পারে। সাতক্ষীরা, বাগেরহাট নিয়ে একটি বিশেষ জাতীয় মৎস্য বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা যায়। প্রতিবেশী দেশ ভারতেও একটি মৎস্য বিশ্ববিদ্যালয় আছে। যেখানে হাইস্কুল লেভেল থেকে পিএইচডি ডিগ্রি পর্যন্ত পড়ানো হয়। এখানে অন্যান্য বিষয় গৌণ। ঠিক তেমনি পাহাড়বিজ্ঞান পড়ানোর জন্য পাহাড়িয়া এলাকা বিশেষ করে রাঙামাটি, বান্দরবান বেছে নেয়া যায়। ছাত্রছাত্রীরা প্রাকটিক্যাল করার সময় পাহাড় ধারেকাছেই পেয়ে যাবে। বন্দরবিজ্ঞানও ওইরকম বিশেষ স্থানেই করা যায়। নেভিগেশনের ওপর উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা দোষের কিছু নয়। সারাবিশ্বেই নাবিকের চাহিদা আছে। আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে অসংখ্য নাবিক তৈরি করতে পারি। ওসানোগ্রাফিক অত্যাধুনিক একটি পাঠ। সুন্দরবন তার জন্য প্রাকৃতিক একটি বিদ্যাপীঠ। তাছাড়া ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল পড়ার জন্য একটি ল্যাবরেটরিও। এভাবে প্রতিটি বিশেষ অঞ্চল বেছে নিয়ে প্রত্যন্তে অনেক বিশেষ কারিকুলামভিত্তিক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করা উচিত এবং ওইসব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থানিক পর্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে কলেজগুলোর একাডেমিক মনিটরিং চালিয়ে যেতে পারবে। খরচ খুব বেশি হবে না। একজন উপাচার্য এবং অনেক উপ-উপাচার্য দিয়ে অতি অল্প খরচে কাজ তুলে আনা যাবে। বিশেষ করে গরিব ছাত্রছাত্রীদের ঢাকায় আসার যাতায়াত খরচ বেঁচে যাবে। অনেকেই দিনে দিনে কাজ সেরে নেবে এবং বাড়ি গিয়ে পাত্তাভাত খাবে। ঢাকায় এসে যারা লাইন দিয়ে কাজ করে তারা অনেকেই পয়সার অভাবে সারাদিন না খেয়ে থাকে। প্রত্যন্তে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস হলে অন্তত এ কষ্ট থেকে বাংলার গরিব ছাত্রছাত্রীরা তো বেঁচে যাবে। ছাত্রীদের কষ্ট আরো বেশি। তাদের পক্ষে একা একা এতোদূর আসা সম্ভব নয়। তাছাড়া তাদের পিতা-মাতাও বেশি পয়সাকড়ি মেয়েদের জন্য খরচ করতে চায় না। মেয়েরা তো হেলেন্তা থেকে রেহাই পাবে। এটা কি বড় কম পাওয়া? নারীবাদীদের তো এ ব্যাপারে সোচ্চার হওয়া উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয় আর কলেজ এক নয়। আমরা যদি মনে করি গরিবদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবো তবে প্রত্যন্তে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে হবে। কলেজগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় মনে করে আহ্লাদ করলে দেশ ও জাতির মেরুদণ্ডে ঘুণপোকার আক্রমণ হবে। হতে পারে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন বিভাগীয় পর্যায়ে মাস্টার্স কোর্স পড়িয়ে কলেজ থেকে অনার্স করাদের একটা হিল্লে করা। যতোজন অনার্স পাস করে ততোজন মাস্টার্স করতে পারে না। এটি জাতির প্রয়োজন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাস্টার্স পড়ায়, অনার্স পড়ায় না। তারা তাদের মতো একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছে। আমরা আমাদের মতো অন্যরকম একটা ব্যবস্থা করে নিই। নইলে বাংলাদেশকে আজীবন পরীক্ষা বিষয়ক রামযাত্রা শুনতেই হবে।

ড. ইশা মোহাম্মদ: প্রাবন্ধিক, গবেষক, কলাম লেখক, অধ্যাপক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

ছাত্রছাত্রীদের সুপারভিশন এবং মনিটরিং করার কোনো সুযোগই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। বাকি থাকে কলেজ পরিদর্শন।

কলেজগুলোর মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সুখকর অভিজ্ঞতার জন্য দিতে পারেনি। কলেজগুলোর সমস্যা দূরীকরণে, সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণে কোনো বিশেষ ভূমিকাই পালন করতে পারেনি। উপরন্তু দেখা গেছে, বিগত সরকারগুলোর কালে এমন কলেজগুলোকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে যেগুলো স্বাধীনভাবে একটি হাইস্কুল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। ঠাট্টা করে বলা হয়, কয়েকটি টিনের শীড়ের দিকে কয়েকটি বাঁশ দিয়ে কলেজ করা হয়েছে। এমনকি কোনো কলেজের ছাউনির নিচে ডিটাও নেই। লাইব্রেরির কথা বললে কলেজ হাসাহাসি করে। তাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস, ছাত্রছাত্রীরা বই পড়ে না, গাইড পড়ে। তারা যা পড়ে না সেগুলো কিনে ইঁদুর দিয়ে খাওয়ানো স্বাস্থ্যসম্মত নয়। টাকা-পয়সার অপচয় এবং

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্বকে যদি প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্তি দিতে হয় তার প্রথমেই এর একাডেমিক নিয়ন্ত্রণের নৈতিক অধিকার তৈরি করতে হবে। নৈতিক অধিকার তৈরি হবে তখনই, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হবে। ছাত্রছাত্রীদের কারিকুলাম অনুশীলন করানোর অভিজ্ঞতাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে প্রত্যন্তে ডিসিমিনেট করতে হবে। প্রত্যন্তের কলেজগুলোতে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার জন্য এবং একাডেমিক সহায়তা প্রদানের জন্য স্থানিক বিশ্ববিদ্যালয়কে দায়িত্ব দিতে হবে। বিশেষ করে প্রশ্নপত্র তৈরি এবং পরীক্ষা নেয়ার ব্যাপারে স্থানিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলোর অভিজ্ঞতা সত্যিকার অর্থে দেশ ও জাতির কাজে লাগানো এর চেয়ে বড় উপায় নেই। প্রশ্ন অসংখ্য হলে 'ফাঁস' হয়ে যাওয়ার বদনাম থেকে সবাই বেঁচে যাবে। ওইসব নির্মাণ করতে পারে। অসংখ্য স্থাপনা পড়ে আছে। যেমন চাষার কলেজ। এগুলোকে কাজে লাগানো যায়।